বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা

যুদ্ধবিধ্বস্ত ছোট্ট একটি দেশ, যার সর্বত্রই ধ্বংসলীলা বিরাজমান। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম ছিল পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষা। সদ্য-স্বাধীন একটি দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতিকে বঙ্গবন্ধু নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন। বাংলাদেশ গড়ার কাজে কম সময় পেলেও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বৃক্ষরোপণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি গণভবন, বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে গাছ লাগান। পাশাপাশি দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে দেশের বৃক্ষসম্পদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি দেশজুড়ে 'বৃক্ষরোপণ অভিযান' শুরু করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঘোড়দৌড় বন্ধ করে গাছ লাগিয়ে সুদৃশ্য উদ্যান তৈরি করেন, যার নাম 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান' রাখেন। এছাড়াও তিনি মহাসড়কের পাশে, বসতবাড়ির আনাচে-কানাচে ও পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই শুভসূচনা হয় উপকূলীয় বনায়ন, যা বাংলাদেশকে আজ সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছে। দেশের বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বঙ্গবন্ধু 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন করেন। ঐ আইনের মাধ্যমেই দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে দেশে 'ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বৃক্ষরোপণ অভিযান কর্মসূচি প্রণয়নে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বর্তমান সময়ে এসে কতটা যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য, তা বলে শেষ করা যাবে না। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে ভুগছে পুরো বিশ্ব। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় দেশগুলো রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম সারির দিকে। তবুও বাংলাদেশ নিজস্ব প্রচেষ্টায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক আন্দোলন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ কালের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁকে দিয়েছে অমরত্বের গৌরব। বঙ্গবন্ধু দেশের নদ-নদী রক্ষা, বৃক্ষসম্পদ বৃদ্ধিসহ সর্বোপরি প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণের যে ডাক দিয়েছিলেন তা দেরিতে হলেও সফলতা পেয়েছে। এসব কাজে প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সময়ে চালু করা হয়েছে জাতীয় পরিবেশ পদক, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, বঙ্গবন্ধু নদী পদক ইত্যাদি। এছাড়াও প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে বহু নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ, যেখানে বলা হয়েছে– 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গাছের চারা রোপণ

তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এর শুরুতে লিখেছেন, 'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা; যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।' এই ভালোবাসা নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দেশের তরুণ প্রজন্মসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে আগামী দিনের কাণ্ডারি হয়ে যে যার অবস্থান থেকে দেশের অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। সব বাঙালির হৃদয়ে 'বঙ্গবন্ধু' নামটি সর্বদা ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলছে। বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসা মানে দেশ, মাটি, মানুষ ও এদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবাসা। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। অবশ্যই প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে গড়া সোনার বাংলা বিশ্বের দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করবে।

উৎস : মো. মতিয়ার রহমান, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

মহান বীর

জেল খেটেছেন জাতির জনক স্বাধীনতার জন্য,
একাত্তরেই স্বাধীন হলো দেশ, জাতি হলো ধন্য।
দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন, শোষণ আর পাকিস্তানি নির্যাতন,
মুজিবের ডাকে হলো স্বাধীন, দূর হলো অপশাসন।
ব্রিটিশের জুতাপেটা, পাক সেনাদের বৈষম্যবাদ, জুলুমবাজি আগ্রাসন,
ডাকে এলো স্বাধীনতা, এলো সুশাসন।
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, নারীনির্যাতন, জুলুম আর ২৪ বছরের বঞ্চনা,
পাক সেনারা নয় মাসে গ্রাম-শহর জ্বালিয়ে, ভেঙে গুঁড়িয়ে, মাটি করলো স্থাপনা।
শুরু হলো মুজিবের দেশ গড়া, ব্রিজ, কালভার্ট বড় বড় ভবন নির্মাণ,
প্রশাসনের অন্তরালে, চুপে চুপে, পয়দা হতে লাগলো মীরজাফর-বেইমান।
কান্ডারি জাতির দেশ গঠনে উদ্যম নব নব,
দুঃখী মানুষের মুখে হাসি এ শুধু মুজিবের স্বপ্ন।
হঠাৎ সেদিন জেগে ওঠা ভোরে কেড়ে নিল জনকের প্রাণ,
কাছে থাকা দুষ্কৃতকারি মানুষরূপী যত বেইমান।
রক্ষা পেল না বঙ্গমাতা, প্রিয় রাসেল নামের আদরের ছোট্ট ছেলে,
যোগ দেয় ঘাতক, খুনি, বেইমান সব মোস্তাকের দলে।
ঠাঁয় পায় মীরজাফর, ভালো-মন্দ সব একখানে,
আন্তর্জাতিক, দূরপ্রাচ্য সব মিলে এক জোটে এক মনে।
ধাপে ধাপে চলে যত ঘাতকের খেলা;
অমানিশায় একদিন শেষ হয় বেলা।
একদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়, সোনার সংসার হবে
যেদিন এদেশের সব মানুষ এক মনে রবে।
আজ মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধুর নামে বাজে করুণ সুর;
ঘুচিবে বেদনা, হারিয়ে তোমায়, ভাবি বঙ্গবন্ধু; তুমি আজ কত দূর !
হারিয়ে তোমায় প্রতি ঘরে ঘরে অঝোর ধারায় বহে ক্রন্দন;
হে বঙ্গবন্ধু, চিরঞ্জীব, শেখ মুজিবুর রহমান;
তোমার বিহনে লাখো কোটি মানুষের চোখে জল ঝরে অবিরাম।
হে বঙ্গবন্ধু, তোমার দয়ায়, তোমার নেতৃত্বে, বাংলায় বহে স্বাধীনতার স্পন্দন।
স্বাধীনতার স্থপতি মহান তুমি, তোমার মৃত্যুতে জাতি আজি হলো স্থবির;
সুখে থাকো, পরপারে, জাতির জনক; হে মহান বীর।

উৎস : ড. আ. স. ম হেলাল উদ্দীন আহম্মেদ সিদ্দীকি, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বিএফআরআই, খুলনা

বঙ্গবন্ধু এবং বিএফআরআই

বসন্তের এক ভোরে নাতিশীতোষ্ণ কোনো প্রহরে,
জন্মে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার এক ঘরে।
শীতের শেষে প্রকৃতি যখন জাগে নতুন প্রাণে,
ধন্য হলো বাংলার রূপ তারই উদ্ভাসিত ঘ্রাণে।

ছোট্ট থেকে মুজিব মোদের ভালোবাসেন গাছ,
তাঁর মতো অকৃত্রিম বন্ধু পাবো না আজ।
এতটুকু ছোট্ট মুজিব বুঝলেন কীভাবে,
গাছ-যে শুধুই দিতে জানে, নিতে জানে না সেভাবে।

বঙ্গবন্ধুর হাতের ছোঁয়া আছে যেখানে,
মাটি থেকে সোনার খনির জন্ম সেখানে।
বাংলার মাটি কত কত-যে খাঁটি,
নব বৃক্ষের রূপ দেখে মুগ্ধ নয়ন দুটি।

মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী আমাদের,
তাইতো চিন্তা নেই কারো, নিয়েছেন দায়িত্ব সকলের।
বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া স্বপ্ন করতে বাস্তবায়ন,
বিএফআরআই-তে যোগ করেছেন সত্যিকারের উন্নয়ন।

একদল বিজ্ঞানী আর গবেষকদের নিয়ে গঠিত দল,
ভাবছেন কেও, পাচ্ছেন ফল উন্নয়ন করতে প্রবল।
চালিয়ে যাচ্ছেন শেষ প্রচেষ্টা, কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে,
রাখছেন বাজি জীবন-মরণ, স্বপ্নের শুরুটা দেখে নিতে।

কাটছে কারো নির্ঘুম রাত, ক্ষুধাময় পেটে
শরীরে ক্লান্তি আর কষ্টের রক্তাক্ত ঘাম মেখে,
এত শক্তি এত বল আসছে কোথা থেকে,
এটা-যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার থেকে।

সেই পাহাড় থেকে নেমে আসা সমতল ভূমি,
গড়ে তুলেছি বন অরণ্য কোথায় নেই তুমি।
সবুজের মাঝে লুকিয় থাকে কীসের এত মায়া,
চারিদিকে ভেসে ওঠে যেন তোমারই প্রতিচ্ছায়া।

পৃথিবী যখন ঝুঁকছে সকল কৃত্রিমতার দিকে,
আমরা তখন দেখিয়ে দিয়েছি সেগুলো সব ফিকে।
তৈরি হচ্ছে বৃক্ষ থেকে আসবাবপত্র আরো কত কিছু,
গুণে মানে শ্রেষ্ঠ সবার, সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে পিছু পিছু।

গাছের থেকে ভালো বন্ধু কে আছে আর,
বোঝা যায় সেটি ভালো করে বিপদে আসে যার।
যেটি বুঝেছিলেন সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু আমাদের,
তাইতো এখনো টিকে আছি আমরা, অস্তিত্ব যুদ্ধের।

গাছের প্রতি এত মায়া এত যার টান,
আল্লাহ তুমি দিয়ো তাকে জান্নাতি সম্মান।
পরিশেষে আমার কথার প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিলাম,
দেশটাকে সাজাবো আমরা যেমন চেয়েছিলাম।

উৎস : লায়লা আবেদা আক্তার, রিসার্চ অফিসার, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধুর পরিবেশ-প্রীতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মহান স্থপতি, মহাবীর। তাঁর পরিবেশ-প্রীতি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সম্মোহনী ক্ষমতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসীম সাহস, দুর্বার তেজস্বিতা নতুন প্রজন্মের জন্য শিক্ষার একটি বিরাট ক্ষেত্র ও অধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর পরিবেশ-প্রীতি ছিল অসাধারণ। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের আকর্ষণে যখনই সুযোগ পেতেন তখনই পরিবেশের সাথে মিশে যেতেন। প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী ও বৃক্ষক্ষয়ী নয় মাস যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত এ-দেশকে সবুজ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পরিবেশ-উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দেন। নয় মাস অযত্ন-অবহেলায় থাকা বৃক্ষসম্পদের মাধ্যমেই-যে পরিবেশ ও পৃথিবী স্নিগ্ধ, কোমল মৃদুমন্দ পরিবেশ ফিরে আসে তা এদেশে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই অনুভব করে বৃক্ষসম্পদের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পাকিস্তান আমলে জেলখানায় অবস্থানকালে জেলখানার ভিতর বাগান করেছেন এবং ঘাস-গাছ, পাখি প্রভৃতির সাথে মিতালি করেছেন। "কারাগারের রোজনামচা" গ্রন্থে পাওয়া যায় তিনি কারা-অভ্যন্তরে বৃক্ষ রোপণ করেছেন। কীভাবে জেলখানায় জোড়া হলুদ পাখি তাঁর লেখায় উৎসাহ জুগিয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বৃক্ষ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পছন্দ করতেন এবং মানুষকে বৃক্ষরোপণের জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি দেশের কোথাও সরকারি অনুষ্ঠানে গেলে সে-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ফলদ, বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করতেন। তিনি ভাবতেন আমাদের উত্তম পরিবেশ হলো দূষণমুক্ত নির্মল বায়ু ও পানি। পরিবেশের নির্মল বাতাসের জন্য বিশুদ্ধ অক্সিজেন সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন; যা তৈরি করে একমাত্র বৃক্ষ। সুতরাং, বৃক্ষরাজি তৈরি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধু গাছ লাগাবার তাগিদ দেন।

৩রা জুলাই, ১৯৭২ সালে খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ চত্বরে জাতির জনকের হাতে রোপিত নারিকেল গাছ আজও জাতির জনকের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে গাছ লাগিয়ে, বৃক্ষ রোপণ করে পরিবেশ-উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু গাছের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় এশিয়ার বিখ্যাত বটগাছ দেখার জন্য ঝিনাইদহের কালিগঞ্জের সুইতলা-বেথুলি-মল্লিকপুর মৌজায় বাইসাইকেলে করে গমন করে ছিলেন বলে জানা যায়।

খুলনা সরকারি মহিলা কলেজে ১৯৭২ সালের ৩রা জুলাই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক রোপিত স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী সেই নারিকেল গাছ।

খুলনা সরকারি মহিলা কলেজে ১৯৭২ সালের ৩রা জুলাই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক রোপিত নারিকেল গাছ ও স্মৃতিফলক।

বঙ্গবন্ধুর বন-জঙ্গল ও প্রাণিকূলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। তিনি সুন্দরবন ভ্রমণ করেছেন। আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার-সম্পাদিত "বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা" গ্রন্থে প্রকাশ (১৪০ পৃ.) : ১৯৭৩ সালে তৎকালীন বন ও পশুসম্পদ মন্ত্রী জনাব সোহরাব সাহেবকে সুন্দরবন দেখার আগ্রহের কথা জানালেন বঙ্গবন্ধু। সবকিছু সঠিকভাবে প্রস্তুত করে স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে দুইদিনে অনেক কিছু দেখালেন, শুনালেন; কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের (সোহরাব হোসেন) একটিই দুশ্চিন্তা প্রধানমন্ত্রী খুব হরিণ পছন্দ করেন কিন্তু তাকে দুদিনে একটি হরিণও দেখানো যায় নাই। যাহোক গোধূলিবেলা,সূর্য অস্তায়মান, চারিদিক নিস্তব্ধ। এমন সময় বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কীরে হরিণ দেখেছিস?" মন্ত্রী মহোদয় মাথা নেড়ে না বোধক জবাব দিতেই বঙ্গবন্ধু বললেন, "তোরা দেখবি কী করে; তোরা তো আর ওদের ভালোবাসিস না-যে তোরা হরিণ দেখবি। আমি এসেছি যখন এখন ঠিকই দেখবি ওরা এসে হাজির হবে।"

১০-১৫ মিনিটের বিরতি। সবাই ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কান পাতলেন, হঠাৎ বনের মধ্য হতে ৩০-৪০টি হরিণের একটি দল বঙ্গবন্ধুদের বাঁয়ে রেখে ডান পাশ দিয়ে আস্তে-আস্তে বনে মিলে গেল। বঙ্গবন্ধু উৎফুল্লচিত্তে মন্ত্রী সোহরাব হোসেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দেখেছিস, বলিনি? আমি এসেছি যখন ওরা আসবেই। আমি-যে ওদের ভালোবাসি। আমার ভালোবাসা বৃথা যেতে পারে না।" এভাবেই প্রতিটি ঘটনা মানুষকে বঙ্গবন্ধুর প্রাণী, পশু-পাখি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা প্রীতির জন্য মনে প্রাণে ভালোবাসার উদ্বেগ ঘটিয়েছে। জাতি তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান রেখে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। আমরা পরম করুণাময়ের কাছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বেহেস্ত কামনা করি আর অন্নদা শঙ্কর রায়ের সাথে সুর মিলিয়ে বলি,

> "যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, গৌরী বহমান,
> ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

উৎস : ড. আ. স. ম হেলাল উদ্দীন আহম্মেদ সিদ্দীকি, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বিএফআরআই, খুলনা

স্বাধীনতা ও শাশ্বত মুজিব

আজ হতে শতবর্ষ (১৯২০ সালের ১৭ মার্চ) আগে তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক স্ফুলিঙ্গের জন্ম হয়েছিল; যার দ্যুতিতে অজস্র সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে নিপিড়ীত, শোষিত বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। আমাদের মুক্তির সংগ্রামের সেই অবিসংবাদী মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে তাঁকে নিয়ে কিছু লেখাটা যেমন সৌভাগ্যের ঠিক তেমনি দুঃসাহসিকও বটে। আমাদের জাতীয় জীবনে চলার পথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে তাঁর মহান আত্মত্যাগ প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা জোগায়।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে; যার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনার পরিক্রমায় ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয়বাংলা'। অতঃপর প্রায় ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বে অতি অল্পসময়ের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়।

অতি অল্পসময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তিনি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার নিমিত্তে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। আজকের এই বাংলাদেশে আমরা বাঙালি জাতি সগৌরবে আমাদের মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। আজকের এই মহালগ্নের সন্ধিক্ষণে সারাবিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল-হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের অভাবনীয় সাফল্যে ও ধারাবাহিকতায় আমরা অতি দ্রুতই আমাদের জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে পারবো– এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস-ই হবে আমাদের আগামী দিনের চলার একমাত্র পাথেয়।

"মুজিব আমাদের চেতনায়, মুজিব আমাদের অস্তিত্বে
মুজিব রবে শাশ্বত, তাঁর আপন দ্যুতিতে "

উৎস : লিটন কুমার সরকার, ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুময় বাংলাদেশ

গণনা কবে থেকে করেছি শুরু
ক্ষণ, দিন, মাস কিংবা বর্ষ,
শুরু হলো নতুন সাল ২০২০
এটাই-যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুজিব-শতবর্ষ।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে
সেই ১৯২০ থেকে ২০২০ বছর,
জন্মেছিলে তুমি সবুজ বাংলার বুকে
আজ তা পূর্ণ করলো ১০০ বছর।

জাতি যখন পড়েছিল কুসংস্কারে
অন্ধকার, অনিয়ম আর শোষণের বেড়াজালে,
এসেছিলে তুমি আল্লাহ্‌র রহমত হয়ে
ফুটাতে হাসি, নিভে যাওয়া গভীর চোখের জলে।

বসন্তের সতেজ আলোয় প্রস্ফুটিত এক ভোরে,
আজানের ধ্বনি কানে এল নতুন সুরে।
সবাই ভাবে কোথা থেকে এলো এত সুর,
আজ-যে জন্ম নিলো বাংলার বন্ধু, সুদিন নয়তো বেশি দূর।

বাংলার মাটি হয়েছিল খাঁটি
তোমারই স্নিগ্ধ জাদুময় ছোঁয়া পেয়ে,
তাইতো তুমি এখনো মিশে আছো
সমগ্র বাংলার প্রান্তে প্রান্তে ছেয়ে।

এমন কী করেছিলে তুমি বাংলায়
শস্য শ্যামলা আলোময় প্রকৃতিতে,
বাংলার মাটি আকাশ বাতাস
কথা কয় এখনো তোমারই প্রতিকৃতিতে।

সিডর থেকে আইলা, ফণী নয়তো বুলবুল
আম্ফানের প্রতাপে সবাই অস্থির যখন,
বুক পেতে দেয় অকুতোভয় সুন্দরবন
ঠিক যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আচরণ।
গ্রিন হাউস ইফেক্ট নিয়ে
সবাই যখন করছে মাতামাতি,
মুজিবময় বাংলার প্রকৃতি এতটাই খাঁটি
বলে, হতে দেবো না কেনো বিচ্যুতি।

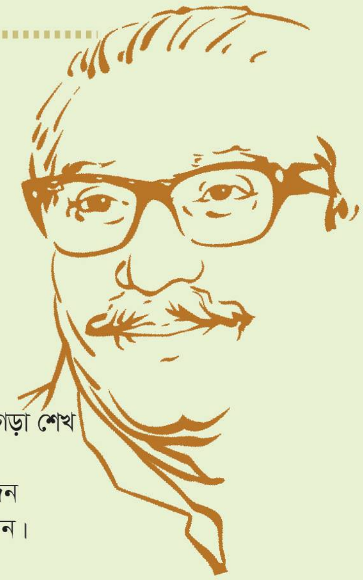

করোনা নিয়ে সারা বিশ্বে যখন নেই কোনো ঘুম,
ধৈর্য ধরো সাহস নিয়ে– এটাই ছিল তোমার আদর্শে গড়া শেখ হাসিনার হুকুম।
তোমার মতো এমন নেতা পাবো না হয়তো কোনোদিন
পরম শ্রদ্ধা নিয়ে বুকের কোণে রাখবো তোমায় চিরদিন।

পরিবেশ দূষণ, বৃক্ষ নিধন, নয়তো প্রাণী মারা,
করছে বিশ্ব দেখছে মানুষ উন্নয়ন ছাড়া।
মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা পাত্তা দেননি এগুলোর কিছু,
তার ইচ্ছা বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নেই যেতে হবে উন্নয়নের পিছু পিছু।

মানুষ যায়, মানুষ আসে, এটাই খেলা প্রকৃতির,
হারিয়ে গেছেন কত মানুষ নিষ্ঠুর খেলা নিয়তির।
হারাতে দেইনি এখনো, হৃদয় গভীরে করে যতন,
তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু, হীরা মানিক রতনের মতোই আপন।

আল্লাহ তুমি ভালো রেখো আমার মুজিবকে পরম যত্নে,
বেহেশতে তুমি গড়ে দিয়ো তাঁর আসনখানা শ্রেষ্ঠ রত্নে।
জন্মশতবর্ষের প্রাপ্তি হিসেবে তাঁকে তুমি দিয়ো উপহার,
মনের সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার পূর্ণ অধিকার।

উৎস : এস. এম. রাকিবুল জুবায়ের, রিসার্চ অফিসার, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

এ এক অন্য রকম শক্তি

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বাংলার আকাশে উদিত হয়েছিল
এক অবিনশ্বর শক্তি– এ এক অন্য রকম শক্তি
আজন্ম বাংলাদেশের এক অদম্য প্রাণশক্তি।
এ শক্তি এক অসমাপ্ত কাহিনি
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জাতীয় চেতনা,
১৯৬৯ এর অগ্ন্যুৎপাতের লাভা, ১৯৭১-এ স্বাধীনতার ঘোষণা।

এ শক্তি দ্বিধাহীন চৈতন্যে উদ্ভাসিত
সহস্র আত্মার মাঝে একত্রে বিলীন,
মুক্তির নেশায় রক্তাক্ত, কোটি কোটি হৃদয়ের একত্রে রাজপথে মিছিল।
এ শক্তি ৩০ লাখ শহিদের রক্তস্নাত বাংলা,
অগণিত সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আর্তচিৎকার,
দুঃস্বপ্নে কালরাত অতিক্রম করা বাঙালির জয় উল্লাস।

বাংলা ছাড় হারামজাদা
নইলে ভাতে মারবো, পানিতে মারবো, ক্যাম্পে মারবো
আমরা বাঙালি আস্ত আণবিক শক্তির অটুট বন্ধন।

এ শক্তি বিজ্ঞানের অবিনাশীবাদ সূত্র
২১শে আগস্টের মতো কোনো অপশক্তি
করতে পারবে না স্তব্ধ।

এ শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে মৃত্যুকূপের শোক
১৮ কোটি বাঙালি শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া
স্বপ্নের সোনার বাংলা।
খরস্রোতা পদ্মা নদীর উপর
এ শক্তি স্বপ্নের পদ্মা সেতু
মহাশক্তি উত্থানের প্রথমপর্ব শুরুর বাস্তব কল্পনা।

সংগ্রাম, যুদ্ধ ও স্বাধীনতার জয়ঢাক
এ শক্তি কোটি কোটি বাঙালি আত্মপ্রাপ্তির হাসি
২০৪১-এ উন্নতবিশ্বের সাথে পাল্লা দেওয়া ডেল্টাপ্ল্যান।
এ শক্তি জনগণের সেবকদের জাতীয় আত্মশুদ্ধির কৌশল
মহামারি করোনা জয় করা ১০৩ বছর বয়সি বৃদ্ধের বেঁচে থাকার নতুন হাসি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা তোমাকে ভালোবাসি।

উৎস : মফিজুল ইসলাম খান, ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

পরিবেশ ও বৃক্ষরোপণের চেতনায় বঙ্গবন্ধু

"বাদলা ঘাসগুলো আমার দুর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা (পৃ: ১৬৬)

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহানায়ক, প্রজ্ঞাবান সূর্যসন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সে-সময়ে পরিবেশ ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব-যে কত বেশি উপলব্ধি করেছেন তা উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়। যার সম্মোহনী নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা আজও অসংখ্য উদ্দীপনামূলক এবং গঠনমূলক কাজে সহায়ক ও অনুপ্রেরণাদায়ক। জাতির পিতা স্বাধীনতাপূর্ব শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশ গঠন করলেও খুব অল্প সময়ই তিনি জাতির কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার সুযোগ পেয়েছেন। তথাপি সেই সময়ের মধ্যেই তিনি যে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা গ্রহণ করেন তা সমাজ, জাতি তথা গোটা বিশ্বের জন্য অবিস্মরণীয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষ্যে দেশবাসীর প্রতি বাণী প্রদান করেন :

"বনাঞ্চলগুলোতে সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন ও অধিক উৎপাদনশীল করার জন্য সরকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারি বনাঞ্চল বহির্ভূত এলাকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় অধিক গাছ লাগিয়ে বৃক্ষসম্পদ-সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এই বৃক্ষরোপণ অভিযানের সময় এবং পরে অধিক বৃক্ষরোপণ করে সরকারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা। কেননা জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া মুষ্টিমেয় সরকারি কর্মচারীর পক্ষে এ-বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই আমি দেশের জনপ্রতিনিধি, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, সমাজসেবী ও আপামর জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন নিজেদের এলাকার স্কুল, কলেজ, কলকারখানা, রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘরের আশপাশে যেখানেই সম্ভব মূল্যবান গাছ লাগিয়ে এবং তার পরিচর্যা করে সরকারের এ-প্রচেষ্টাকে সফল করবেন।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সে-সময়েই পরিবেশ উন্নয়ন, বনভূমির প্রয়োজনীয়তা, কৃষি বনায়ন, গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি সচল রাখা এবং সর্বোপরি মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের বিপর্যয়-রোধে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ ও ভাষণসমূহ আজও জাতির জন্য স্বমহিমায় উজ্জ্বল দিক-নির্দেশক ও পথপ্রদর্শক। বঙ্গবন্ধুর চেতনায়

বাগানের পরিচর্যাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

উজ্জীবিত হয়েই তাঁর সুযোগ্য কন্যা, জননেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং পরিবেশের সাথে বনায়নের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

"একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

কী চাস তোরা?

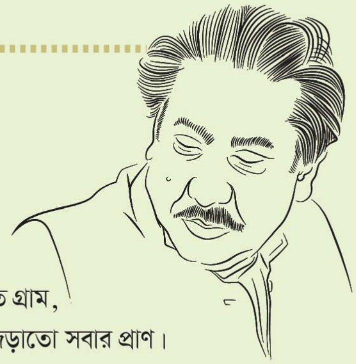

সবার মাঝে চপল শিশু মাতিয়ে নিত গ্রাম,
সেই শিশুই জাতির পিতা নিভৃতে জড়াতো সবার প্রাণ।
সোনার বাংলার সোনার শিশু সোনার মানুষ হবে,
অনাদিকাল সেই শিশুর কৃতকর্ম রয়ে যাবে।
গরিব দুঃখীর মুখের হাসি নিজের মনের আশা,
ঘুচিয়ে দুঃখ ভরাতো সুখ;
সকলের মনের মিটাতো আশা, রইতো না কারও দুখ।
শত্রু মিত্র আপন ভেবে নিঃসংকোচে জীবন দিলেন মুজিব নামের পিতা,
বেইমানদেরই বলে গেলেন, "বেইমান কী চাস তোরা ? মোর জীবনটাই কি বৃথা?"
অনন্তকাল রবে বাংলায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি
তুমি জন্মেছিলে বলেই ধন্য হলো সোনার বাংলার মাটি।
তোমার প্রতি চিরকালই থাকবে ভালোবাসা
বেহেস্ত নসিব কর আল্লাহ-এ মোদেরই আশা।

উৎস : ড. আ. স. ম হেলাল উদ্দীন আহম্মেদ সিদ্দীকি, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বিএফআরআই, খুলনা

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উপরিউক্ত উক্তিতে দেশ, মানবজাতি, বাঙালিদেরকে নিয়ে অপরিসীম ভালোবাসা, শক্তি, অস্তিত্বের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে তার সাথে তাল মিলিয়ে ও মুজিববর্ষকে সামনে রেখে আমাদের সকলকে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব রোধ, বনভূমি রক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও সচেতনতা, পরিবেশ ও বনভূমি রক্ষায় গবেষণা বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে গৌরবের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

উৎস : মো. আকরামুল ইসলাম, রিসার্চ অফিসার, বিএফআরআই, খুলনা।

বঙ্গবন্ধু: জন্মশতবর্ষে প্রণতি তোমায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন,

'ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের উপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল,
গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের ধারা, যাঁর নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া।'

(শামসুর রাহমান, ধন্য সেই পুরুষ, অবিরল জলভ্রমি, ১৯৮৬)

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম নেয় এক বালক। সেদিনের সেই আঁতুড়ঘরে জন্ম নেয়া খোকা পল্লি অঞ্চলের আর দশটি সন্তানের মতোই এক পরাধীন দেশের মাটিতে জন্ম নেয়। তবে একদিন এই খোকাই হয়ে উঠবে ইতিহাসের নিয়ন্তা, একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালি জাতির জনক। ইতিহাস নিজের প্রয়োজনে আন্দোলন-সংগ্রামকে সার্থক করার জন্যই নেতা তৈরি করে। বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসও সময়ে সময়ে অনেক নেতা তৈরি করেছে। তখন নেতা হয়ে ওঠেন ইতিহাসের মানসপুত্র। একেকজন হয়ে ওঠেন ইতিহাস নামক মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠা, পঙক্তি বা অধ্যায়। কেউবা হয়ে ওঠেন সমগ্র ইতিহাস। কিন্তু কোনো নেতাই বাঙালির ইতিহাস নিজ হাতে রচনা করতে পারেননি। একজন নিজ হাতে রচনা করলেন। ধীরে ধীরে তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন বাঙালির ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ আলোচনা করলে যাঁর আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। তিনি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুই হয়ে উঠলেন বাঙালি জাতির সমগ্র ইতিহাস। এক্ষেত্রে ইতিহাস ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিই ইতিহাসের জন্ম দিলেন; এত অল্প সময়ে যা কেউ কোনোদিন পারেনি। তা-ই করে দেখালেন তিনি। হাজার বছরের ভূমিহীন বাঙালির জন্য ব্যবস্থা করলেন একটি সার্বভৌম ভূখণ্ডের। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, 'বার-বার জেলে গিয়ে বার-বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি একদিন সত্যি-সত্যিই পেয়ে যান তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ অবিভক্ত না হলেও সার্বভৌম ও স্বাধীন। 'একজন ব্যক্তি তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সে এর চেয়ে বেশি সার্থকতা প্রত্যাশা করতে পারেন কি? আর কেউ কি পারতেন?' (অন্নদাশঙ্কর রায়, শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ, ১৯৭৯)

১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে দেওয়া ভাষণে বলেন, 'আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে।' তাঁর আপসহীন ও নির্ভীক হৃদয় তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। ছোটবেলাই বঙ্গবন্ধুর সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'অসমাপ্ত

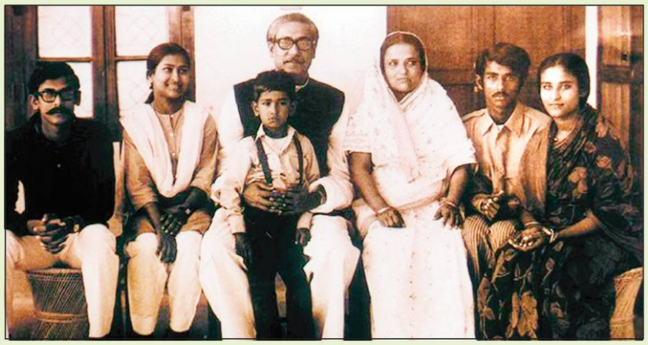

আত্মজীবনী'তে আছে, আব্দুল মালেক নামে বঙ্গবন্ধুর এক সহপাঠীকে হিন্দু মহাসভার লোকজন ধরে নিয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু তাঁকে উদ্ধার করেন। এসময় দুপক্ষের মধ্যে মারপিটও হয়। হিন্দুনেতারা বঙ্গবন্ধুর নামে মামলা দায়ের করে। থানার দারোগা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে আসেন। বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই তাঁকে সরে যেতে বললে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।' (শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২০১২, পৃষ্ঠা ১২)

ভয় তাঁর মধ্যে ছিল না বলেই বঙ্গবন্ধু বলছেন, 'বলেছিলাম (পাকিস্তানি শাসককে), আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। একবার মরে দুইবার মরে না। ...তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে তোমরা আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিয়ো, এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে।'

'১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০' – এই বছরগুলোয় তিনি ধাপে ধাপে রচনা করেছেন প্রতিবাদ ও সংগ্রামের ইতিহাস। তিন স্বয়ং হয়ে উঠলেন ইতিহাসের অংশ। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তাঁর স্বোপার্জিত শক্তি আর সাহসের কারণে। পৃথিবীর ইতিহাসে একক মানুষের অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন এই প্রথম, হয়তো এই শেষ।' এ এক পরম কৃতিত্ব তাঁর, পরম পাওয়া আমাদেরও। ঘাতকের বুলেট তাঁকে নিয়ে গেছে ওপারে কিন্তু তিনি বাঙালি জাতির হৃদয়ে রয়েছেন স্বমহিমায়। বাঙালি জাতি ভালোবেসে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছে। দিয়েছে 'জাতির জনক' উপাধি। বঙ্গবন্ধু, জন্মশতবর্ষে প্রণতি তোমায়।

উৎস : এয়াকুল আলী, পাবলিসিটি অফিসার, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

উপকূল ও বঙ্গবন্ধু, উপকূলীয় বন গবেষণায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা

বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৩০ ভাগ উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় ক্রমাগত পলি পড়ার কারণে প্রতিবছরই নতুন নতুন চর সৃষ্টি হচ্ছে। অবস্থানগত কারণে দেশের উপকূলীয় এলাকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাসে প্রতিবছরই কম-বেশি এ এলাকা দুর্যোগ কবলিত হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর এ জনপদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ-অঞ্চলে বর্ষাকালে জোয়ারের স্থায়িত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাটা শেষ হতে-না-হতেই আবার জোয়ারের পানি ঢুকে যাচ্ছে লোকালয়ে। নদীগুলোর নাব্যতা মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন। এ অবস্থা চলতে থাকলে উপকূলের নীচু ভূমিগুলোতে বর্ষাকালে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে।

উপকূলীয় অঞ্চল ও বঙ্গবন্ধু

বাঙালি জাতির রূপকার, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দুর্দশাগ্রস্ত উপকূল অঞ্চলে বারবার ছুটে গিয়েছেন। ১৯৭০ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ প্রলংঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে যখন এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল লন্ডভন্ড, চারিদিকে হাহাকার, স্বজনহারা মানুষের শোকের মাতম তখন তিনি ছুটে গিয়েছেন। কয়েকজন সহযাত্রীকে সাথে নিয়ে ছোট্ট একটি লঞ্চে করে বিক্ষুব্ধ আগুনমুখো নদী পাড়ি দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের দুদিন পরে পৌঁছান পটুয়াখালীর দুর্গম এলাকা রাঙ্গাবালীর বাহেরচরে। স্বচক্ষে এসব দেখেছেন, ভেবেছেন কীভাবে তাঁর দেশের এসব অসহায় মানুষকে রক্ষা করা যায়। ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের মাঝে তিনি নিজ হাতে শুকনো খাবার ও বস্ত্র বিতরণ করেছেন। তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। ভেবেছেন বৃক্ষরোপণের কথা। এ অঞ্চলের জেগে ওঠা চরগুলোতে বনায়নের বিষয়ে বলেছেন। উপকূল রক্ষায় নিয়েছেন কার্যকরী পদক্ষেপ। তারই ফলশ্রুতিতে এ-অঞ্চলে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পরই উপকূল বরাবর জেগে ওঠা নতুন চরে ব্যাপক ম্যানগ্রোভ-বনায়ন শুরু হয়।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট (পিটিইউ) বিভাগটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিভাগটি ১৯৮৫ সাল হতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কৃত্রিম উপায়ে সৃজিত বনাঞ্চলে এবং উপকূল বরাবর জেগে ওঠা নতুন চরে টেকসই বন সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারার উত্তোলন কৌশল, স্থান উপযোগী ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন ও বনায়ন কৌশল, উপকূলীয় উঁচু ভূমির উপযোগী নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন ও বনায়ন কৌশল উদ্ভাবন, উপকূলীয় ভেড়িবাঁধে বনায়নের জন্য প্রজাতি নির্বাচন, উপকূলীয় উঁচু ভূমিতে ও ভেড়িবাঁধে রোপণের জন্য ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন, উপকূলীয় বসতবাড়িতে লাগানোর জন্য বাঁশ ও বেতের প্রজাতি নির্বাচন ও চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নয়ন, বসতবাড়িতে ফলদ বৃক্ষের চাষাবাদ, বসতভিটায় কৃষি-বন পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। উপকূলীয় ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় জনপদ ও অবকাঠামো রক্ষায় গবেষণার এ-ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহিক গবেষণায় বেশকিছু প্রযুক্তি ও তথ্য উদ্ভাবন করা হয়েছে; যা টেকসই ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন এবং উপকূলীয় বনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য অধিক লবণ-সহিষ্ণু ম্যানগ্রোভ ও নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন টেকসই বনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকার সাথে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যে আত্মিক সম্পর্ক ছিল তা আমরা তাঁর বারবার উপকূল অঞ্চলে গমন, উপকূলীয় বনায়নে তাঁর ভূমিকা তাঁর চিন্তা চেতনায় এসবের প্রকাশ দেখতে পাই। এ উপকূলীয় অঞ্চলের নতুন জেগে ওঠা চরগুলোতে, স্থায়ী হওয়া উঁচু ভূমিগুলোতে এবং ফাঁকা ও পতিত পড়ে থাকা ভূমিগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এ-অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

উৎস : মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দস মিয়া, রিসার্চ অফিসার, বিএফআরআই, বরিশাল।

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শৈশব থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে ভাবনা ছিল সুগভীর। দেশমাতৃকার প্রতি যে ভালোবাসা বঙ্গবন্ধু সবসময় অনুভব করতেন, ঠিক তেমনি দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিও ছিল তাঁর অন্যরকম ভালোবাসা। রাজনৈতিক মামলায় কারাগারে থাকার সময় তিনি জেলেখানাতে বসেই ফুল ও ফলের গাছ লাগানোর পাশাপাশি সব্জির বাগান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর "কারাগারের রোজনামচা" বইতে জেলে গাছরোপণ ও বাগান-পরিচর্যার দরদি বর্ণনা পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী প্রজ্ঞায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের বিষয়কে অধিক গুরুত্বারোপে আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তাবিধান করিবেন।" জাতির পিতার দূরদর্শী কর্মকাণ্ড থেকে বাদ যায়নি বৃক্ষরোপণের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য-স্বাধীন দেশে ক্ষতিসাধন হওয়া বৃক্ষসম্পদের ক্ষতি পূরণের লক্ষে বাড়ির আশেপাশে, পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণের জন্যে সবাইকে আহ্বান জানান। দেশের জনগণ বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে বৃক্ষরোপণ একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সবুজ পরিবেশ আন্দোলন সমগ্র দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছে। একজন পরিবেশ-প্রেমিক, প্রকৃতি-প্রেমিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সব সময় পরিবেশের উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য দিতেন। পরিবেশ সংরক্ষণে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ প্রতিরোধে বনায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদের অবৈধ পাচার রোধে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু 'চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস-১৯৭৩' জারি করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পেতে উপকূলীয় বাঁধ ও বনায়নের ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উপকূলীয় অঞ্চলকে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচাতে সুন্দরবনের ভূমিকা কিন্তু দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহের উদ্বোধন-কালেই সুন্দরবন যে উপকূলের সুরক্ষা প্রাচীর তা সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন।

সেদিন তিনি বলেছিলেন, "আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য। বঙ্গোপসাগরের পাশে যে সুন্দরবনটা রয়েছে, এইটা হলো বেরিয়ার। এটা যদি রক্ষা করা না হয় তাহলে একদিন খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ সমুদ্রের মধ্যে চলে যাবে এবং এগুলো হাতিয়া, সন্দ্বীপের মত আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার যদি সুন্দরবন শেষ হয়ে যায়, তো সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে, সেই ভাঙন থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় থাকবে না।" বঙ্গবন্ধু সবুজ প্রকৃতির বিষয়ে প্রজ্ঞাবান ছিলেন বলেই এত স্পষ্টভাবে সতর্কবাণী করতে পেরেছিলেন। আজকে বাংলাদেশের রাস্তার দু-পাশে যে সারি সারি বৃক্ষরাজি আমাদের প্রকৃতিকে অপরূপ করেছে, এর সূচনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। আর সেজন্যই তো দুর্যোগ মোকাবেলায় সারা বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ২০১৫ সালে জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হন।

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় জাতির জনকের পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ আজ সবুজায়নের চাদরে আচ্ছাদিত। সমগ্র দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষে শোভিত নির্মল পরিবেশ বিরাজমান। দেশের বৃক্ষ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুজিব শতবর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

উৎস : মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : ড. রফিকুল হায়দার	-	পরিচালক	মো. জাহাঙ্গীর আলম	-	আহ্বায়ক
অসীম কুমার পাল	-	সদস্য সচিব	মো. মতিয়ার রহমান	-	সদস্য
এয়াকুব আলী	-	সদস্য	ছৈয়দুল আলম	-	সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd
ফোন : +৮৮-০২৩৩৪৪৮১৫৭৭, +৮৮-০২৩৩৪৪৮২৫৮৬